আত তারিক

৮৬

নামকরণ

প্রথম আয়াতে اَلطَّارِقِ শব্দটিকে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বক্তব্য বিষয়ের উপস্থাপনা পদ্ধতির দিক দিয়ে মক্কা মুআ'য্যমার প্রাথমিক সূরাগুলোর সাথে এর মিল দেখা যায়। কিন্তু মক্কার কাফেররা যখন কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাযিল হয়।

সর্বপ্রথম আকাশের তারকাগুলোকে এ মর্মে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, এ বিশ্ব–জাহানে কোন একটি জিনিসও নেই যা কোন এক সত্তার রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত ও অস্তিত্বশীল থাকতে পারে। তারপর মানুষের দৃষ্টি তার নিজের সত্তার প্রতি আকৃষ্ট করে বলা হয়েছে, দেখো কিভাবে এক বিন্দু শুক্র থেকে অস্তিত্ব দান করে তাকে একটি জ্বলজ্যান্ত গতিশীল মানুষে পরিণত করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, যে আল্লাহ এভাবে তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন তিনি নিশ্চিতভাবেই তাকে দ্বিতীয়বার পয়দা করার ক্ষমতা রাখেন। দুনিয়ায় মানুষের যেসব গোপন কাজ পর্দার আড়ালে থেকে গিয়েছিল সেগুলোর পর্যালোচনা ও হিসেব–নিকেশই হবে এই দ্বিতীয়বার পয়দা করার উদ্দেশ্য। সে সময় নিজের কাজের পরিণাম ভোগ করার হাত থেকে বাঁচার কোন ক্ষমতাই মানুষের থাকবে না এবং তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ এগিয়ে আসতেও পারবে না।

সবশেষে বলা হয়েছে, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং মাটি থেকে গাছপালা ও ফসল উৎপাদন যেমন কোন খেলা তামাসার ব্যাপার নয় বরং একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ, ঠিক তেমনি কুরআনে যেসব প্রকৃত সত্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোও কোন হাসি তামাসার ব্যাপার নয়। বরং সেগুলো একেবারে পাকাপোক্ত ও অপরিবর্তনীয় কথা। কাফেররা এ ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছে যে, তাদের চালবাজী ও কৌশল কুরআনের এই দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। কিন্তু তারা জানে না, আল্লাহও একটি কৌশল অবলম্বন করছেন এবং তাঁর কৌশলের মোকাবিলায় কাফেরদের যাবতীয় চালবাজী ও কৌশল ব্যর্থ হয়ে যাবে। তারপর একটি বাক্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা এবং পর্দান্তরালে কাফেরদের ধমক দিয়ে কথা এভাবে শেষ করা হয়েছে ঃ তুমি একটু সবর করো এবং কিছুদিন কাফেরদেরকে ইচ্ছেমতো চলার সুযোগ দাও। কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা টের পেয়ে যাবে, তাদের চালবাজী ও প্রতারণা কুরআনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। বরং যেখানে তারা কুরআনকে ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেখানে কুরআন বিজয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে।

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝١ وَمَا أَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۝٢ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝٣ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝٤ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝٦ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝٧ إِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝٨

কসম আকাশের এবং রাতে আত্মপ্রকাশকারীর। তুমি কি জানো ঐ রাতে আত্মপ্রকাশকারী কি? উজ্জ্বল তারকা। এমন কোন প্রাণ নেই যার ওপর কোন হেফাজতকারী নেই।[১] কাজেই মানুষ একবার এটাই দেখে নিক কী জিনিস থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে![২] তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রবলবেগে নিঃসৃত পানি থেকে, যা পিঠ ও বুকের হাড়ের মাঝখান দিয়ে বের হয়।[৩] নিশ্চিতভাবেই তিনি (স্রষ্টা) তাকে দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন।[৪]

১. হেফাজতকারী বলতে এখানে আল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর ছোট বড় সকল সৃষ্টির দেখাশুনা, তত্বাবধান ও হেফাজত করছেন। তিনিই সব জিনিসকে অস্তিত্ব দান করেছেন তিনিই সবকিছুকে টিকিয়ে রেখেছেন। তিনি সব জিনিসকে ধারণ করেছেন বলেই প্রত্যেকটি জিনিস তার নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি সব জিনিসকে তার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার এবং তাকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত বিপদমুক্ত রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন। এ বিষয়টির জন্য আকাশের ও রাতের অন্ধকারে আত্মপ্রকাশকারী প্রত্যেকটি গ্রহ ও তারকার কসম খাওয়া হয়েছে। আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ শব্দ একবচন হলেও এখানে এর মানে কিন্তু একটি তারকা নয় বরং তারকা মণ্ডলী। ফলে এখানে এ কসমের অর্থ এ দাঁড়ায় ঃ রাতের আকাশে এই যে অসংখ্য গ্রহ তারকা ঝলমল করতে দেখা যায় এদের প্রত্যেকটির অস্তিত্ব এ মর্মে সাক্ষ প্রদান করছে যে অবশ্যি কেউ একজন আছেন যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, এগুলোকে আলোকিত করেছেন, এগুলোকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন এবং এমনভাবে এদেরকে হেফাজত করছেন যার ফলে এরা নিজেদের স্থান থেকে ছিটকে পড়ে না এবং অসংখ্য তারকা একসাথে আবর্তন করার সময় একটি তারকা অন্য তারার সাথে ধাক্কা খায় না বা অন্য কোন তারা তাকে ধাক্কা দেয় না।

২. উর্ধজগতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর এবার মানুষকে তার নিজের সত্তা সম্পর্কে একটু চিন্তা করার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। তাকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? কে পিতার দেহ থেকে নির্গত কোটি কোটি শুক্রকীটের মধ্য থেকে একটি শুক্রকীট এবং মায়ের গর্ভ থেকে নির্গত অসংখ্য ডিম্বের মধ্য থেকে একটি ডিম্ব বাছাই করে দেয় এবং কোন এক সময় তাদের সম্মিলন ঘটায় এবং তারপর এক বিশেষ মানবীর গর্ভ ধারণ সংগঠিত হয়? গর্ভ সঞ্চারের পর কে মায়ের উদরে তার ক্রমবৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন করে? তারপর কে তাকে একটি জীবিত শিশুর আকারে জন্মলাভ করার পর্যায়ে পৌছিয়ে দেয়? কে মায়ের গর্ভাধারের মধ্যেই তার শারীরিক কাঠামো এবং দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতাসমূহের অনুপাত নির্ধারণ করে দেয়? কে জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অনবরত তার তত্ত্বাবধান করে? তাকে রোগ মুক্ত করে। দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করে। নানা প্রকার আপদ–বিপদ থেকে বাঁচায়। তার জন্য বহুতর সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে। তার নিজের এসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করার কোন ক্ষমতাই নেই। এমনকি এগুলো সম্পর্কে কোন চেতনাই তার নেই। এসবকিছুই কি এক মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান ছাড়াই চলছে?

৩. এখানে মূল আয়াতে সুল্‌ব (صلب) ও তারায়েব (ترائب) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'সুল্‌ব' মেরুদণ্ডকে ও 'তারায়েব' বুকের পাঁজরকে বলা হয়। যেহেতু যে উপাদান থেকে পুরুষ ও নারীর জন্ম হয় তা মেরুদণ্ড ও বুকের মধ্যস্থিত ধড় থেকে বের হয়, তাই বলা হয়েছে পিঠ ও বুকের মধ্যস্থল থেকে নির্গত পানি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের হাত–পা কর্তিত অবস্থায়ও এ উপাদান জন্ম নেয়। তাই একথা বলা ঠিক নয় যে, সারা শরীর থেকে এ উপাদান বের হয়। আসলে শরীরের প্রধান অঙ্গগুলোই হচ্ছে এর উৎস। আর এ প্রধান অঙ্গগুলো সব ধড়ের সাথে সংযোজিত। মস্তিষ্কের কথা আলাদা করে না বলার কারণ হচ্ছে এই যে, মেরুদণ্ড মস্তিষ্কের এমন একটি অংশ যার মাধ্যমে শরীরের সাথে মস্তিষ্কের সম্পর্ক বজায় রয়েছে।*

* মাসিক তরজুমানুল কুরআনে এই ব্যাখ্যাটি প্রকাশিত হবার পর জনৈক ডাক্তার সাহেব মাওলানা মওদূদীকে (র) লেখেন : "আপনার ব্যাখ্যাটি আমি মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়লাম। কিন্তু আমি বিষয়টি বুঝতে পারলাম না। কারণ বাস্তব পর্যবেক্ষণে আমরা দেখি, অণ্ডকোষে (Testicles) বীর্যের জন্ম হয়। তারপর সরু সরু নালীর মাধ্যমে বড় বড় নালীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে তা পেটের দেয়ালের অভ্যন্তরে কোমরের হাড়ের ঠিক বরাবর একটি নালী (Inguinal Canal) অতিক্রম করে নিকটবর্তী একটি গ্রন্থিতে প্রবেশ করে। এই গ্রন্থিটির নাম Prostate. এরপর সেখান থেকে তরল পদার্থ নিয়ে এর নির্গমন হয়। মেরুদণ্ড ও বুকের পাঁজরের মধ্যে এর অগ্রসর হবার ব্যাপারটি আমার বোধগম্য হলো না। অবশ্য এর নিয়ন্ত্রণ এমন একটি নার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে হয় যা মেরুদণ্ড ও বুকের পাঁজরের মাঝখানে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। তাও একটি বিশেষ সীমিত পর্যায়ে। এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আবার মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত আর একটি গ্রন্থির তরল পদার্থের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এখানে নির্গমনের (যা একটি নালীর মাধ্যমেই হতে পারে) আমার আবেদন, এর ব্যাখ্যা কি, এটা আপনি বিস্তারিতভাবে লেখেন। আমি আপনাকে বিরক্ত করতে সাহস করলাম এ জন্য যে, আপনি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান চর্চায় বিশ্বাস করেন।"

এর জবাবে মাওলানা ১৯৭১ সালের নভেম্বরের তরজুমানুল কুরআন সংখ্যায় পরবর্তী প্যারাটি লেখেন :

৪. অর্থাৎ যেভাবে তিনি মানুষকে অস্তিত্ব দান করেন এবং গর্ভ সঞ্চারের পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তার দেখাশুনা করেন তা একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করে যে, তিনি মৃত্যুর পর আবার তাকে অস্তিত্বশীল করতে পারেন। যদি তিনি প্রথমটির ক্ষমতা রেখে থাকেন এবং তারি বদৌলতে মানুষ দুনিয়ায় জীবন ধারণ করছে, তাহলে তিনি দ্বিতীয়টির ক্ষমতা রাখেন না, এ ধারণা পোষণ করার পেছনে এমন কি শক্তিশালী যুক্তি পেশ করা

যদিও শরীরের বিভিন্ন অংশের কার্যাবলী (Functions) আলাদা তবুও কোন অংশ নিজে একাকী কোন কাজ করে না। বরং প্রত্যেকে অন্যের কার্যাবলীর সহায়তায় (Co-oridination) নিজের কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে। নিসন্দেহে বীর্যের জন্ম হয় পুরুষাঙ্গে এবং সেখান থেকে তা বের হয়েও আসে একটা বিশেষ পথ দিয়ে। কিন্তু পাকস্থলী, কলিজা, ফুসফুস, কিডনী, লিভার ও মস্তিষ্ক প্রত্যেকে স্বস্থানে নিজের কাজটি না করলে বীর্য জন্মাবার ও নির্গত হবার এ ব্যবস্থাটি কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের কাজ করতে সক্ষম? অনুরূপভাবে দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, কিডনীতে পেশাব তৈরি হয় এবং একটি নালীর সাহায্যে মূত্রাশয়ে পৌঁছে পেশাব নির্গত হবার পথ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু কিভাবে কোন্ কার্যক্রমের ফলে? রক্ত প্রস্তুতকারী ও তাকে সমগ্র দেহে আবর্তিত করে কিডনী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্বে যেসব অঙ্গ নিয়োজিত তারা যদি নিজেদের দায়িত্ব পালন না করে তাহলে কি কিডনী একাই রক্ত থেকে পেশাবের উপাদানগুলো আলাদা করে সেগুলোকে এক সাথে পেশাবের নালী দিয়ে বাইরে বের করে দিতে সক্ষম হবে? তাই কুরআন মজীদে বলা হয়নি যে, এ উপাদানগুলো মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাড় থেকে নির্গত হয় বরং বলা হয়েছে, "ঐ দু'টোর মধ্যখানে শরীরের যে অংশটি রয়েছে সেখান থেকে এ উপাদানগুলো নির্গত হয়।" এতে একথা অস্বীকার করা হয়নি যে বীর্য তৈরি হবার ও তার নির্গমনের একটি বিশেষ কর্মপ্রণালী (Mechanism) রয়েছে, শরীরের বিশেষ কিছু অংশ এ কাজে নিয়োজিত থাকে। বরং এ থেকে একথা প্রকাশ হয় যে, এ কর্মপ্রণালী স্বতঃপ্রবৃত্ত নয়। মহান আল্লাহ মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলে যেসব অঙ্গ সংস্থাপন করেছেন তাদের সমগ্র কর্মের সহায়তায় এ কাজটি সম্পাদিত হয়। এ জন্য আমি আগেই বলেছি যে, সমগ্র শরীর এ কাজে অংশ নেয়নি। কেননা হাতপা কর্তিত অবস্থায়ও এ ব্যবস্থাকে কর্মরত দেখা যায়। তবে মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলে যেসব বড় বড় অঙ্গ রয়েছে তাদের কোন একটিও যদি না থাকে তাহলে এ কর্মপ্রণালী অচল বলা যেতে পারে।

"ভ্রূণতত্ত্বের (Embryology) দৃষ্টিতে এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে, ভ্রূণের (Foetus) মধ্যে যে অণ্ডকোশে (Testicle) বীর্যের জন্ম হয় তা মেরুদণ্ড ও বক্ষ পাঁজরের মধ্যস্থলে কিডনীর নিকটেই অবস্থান করে এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে পুরুষাঙ্গে নেমে আসে। এ কার্যধারা সংঘটিত হয় জন্মের পূর্বে আবার অনেক ক্ষেত্রে তার কিছু পরে। কিন্তু তবুও তার স্নায়ু ও শিরাগুলোর উৎস সবসময় সেখানেই (মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলে) থাকে। বরং পিঠের নিকটবর্তী মহাধমনী (Artery) থেকে শিরাগুলো (Aorta) বের হয় এবং পেটের সমগ্র অঞ্চল সফর করে সেখানে রক্ত সরবরাহ করে। এভাবে দেখা যায় অণ্ডকোষ আসলে পিঠের একটি অংশ। কিন্তু শরীরের অতিরিক্ত উষ্ণতা সহ্য করার ক্ষমতা না থাকার কারণে তাকে পুরুষাঙ্গে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। উপরন্তু যদিও অণ্ডকোষ বীর্য উৎপাদন করে এবং তা মৌলিক কোষে (Seminal Vesicles) জমা থাকে তবুও মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলই হয় তাকে বের করার কেন্দ্রীয় সঞ্চালন শক্তি। মস্তিষ্ক থেকে স্নায়ুবিক প্রবাহ এ কেন্দ্রে পৌঁছার পর কেন্দ্রের সঞ্চালনে (Triger Action) মৌলিক কোষ সংকুচিত হয়। এর ফলে তরল শুক্র পিচকারীর ন্যায় প্রবল বেগে বের হয়। এ জন্য কুরআনের বক্তব্য চিকিৎসা শাস্ত্রের সর্বাধুনিক পরীক্ষা- নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান লব্ধ জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীল।"

মওলানার এই জবাবটি প্রকাশিত হবার পর দু'জন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ দু'টি বিভিন্ন স্থান থেকে মাওলানার বক্তব্য সমর্থন করে যে তথ্য সরবরাহ করেন তা সর্বশেষ প্যারায় সন্নিবেশিত হয়েছে। –অনুবাদক

يَوۡمَ تُبۡلَى السَّرَآئِرُ ﴿۹﴾ فَمَا لَهٗ مِنۡ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ﴿۱۰﴾ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجۡعِ ﴿۱۱﴾ وَالۡاَرۡضِ ذَاتِ الصَّدۡعِ ﴿۱۲﴾ اِنَّهٗ لَقَوۡلٌ فَصۡلٌ ﴿۱۳﴾ وَّمَا هُوَ بِالۡهَزۡلِ ﴿۱۴﴾ اِنَّهُمۡ يَكِيۡدُوۡنَ كَيۡدًا ﴿۱۵﴾ وَّاَكِيۡدُ كَيۡدًا ﴿۱۶﴾ فَمَهِّلِ الۡكٰفِرِيۡنَ اَمۡهِلۡهُمۡ رُوَيۡدًا ﴿۱۷﴾

যেদিন গোপন রহস্যের যাচাই বাছাই হবে,[৫] সেদিন মানুষের নিজের কোন শক্তি থাকবে না এবং কেউ তার সাহায্যকারীও হবে না। কসম বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের[৬] এবং (উদ্ভিদ জন্মাবার সময়) ফেটে যাওয়া যমীনের, এটি মাপাজোকা মীমাংসাকারী কথা, হাসি-ঠাট্টা নয়।[৭] এরা কিছু চক্রান্ত করছে[৮] এবং আমিও একটি কৌশল করছি।[৯] কাজেই ছেড়ে দাও, হে নবী! এ কাফেরদেরকে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য এদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও।[১০]

যেতে পারে? আল্লাহর এই শক্তিকে অস্বীকার করতে হলে আল্লাহ যে তাকে অস্তিত্বদান করেছেন সরাসরি একথাটিই অস্বীকার করতে হবে। আর যে ব্যক্তি একথা অস্বীকার করবে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি একদিন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় যার ফলে সে দাবী করে বসবে, এ দুনিয়ায় সমস্ত বইপত্র একদিন ঘটনাক্রমে ছাপা হয়ে গেছে, দুনিয়ার সমস্ত শহর একদিন হঠাৎ ঘটনাক্রমে তৈরি হয়ে গেছে এবং এই দুনিয়ায় হঠাৎ একদিন এমন এক ঘটনা ঘটে গেছে যার ফলে সমস্ত কলকারখানা আপনা আপনি নির্মিত হয়ে তাতে উৎপাদন শুরু হয়ে গেছে। আসলে মানুষ দুনিয়ায় যেসব কাজ করেছে ও করছে তার তুলনায় তার সৃষ্টি ও তার শারীরিক গঠনাকৃতি এবং তার মধ্যে কর্মরত শক্তি যোগ্যতাসমূহের সৃষ্টি এবং একটি জীবন্ত সত্তা হিসেবে তার টিকে থাকা অনেক বেশী জটিল কাজ। এত বড় জটিল কাজ যদি এ ধরনের জ্ঞানবত্তা, উন্নত কলাকৌশল, আনুপাতিক ও পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রম এবং সাংগঠনিক শৃংখলা সহকারে হঠাৎ ঘটনাক্রমে ঘটে যেতে পারে, তাহলে দুনিয়ার আর কোন্ কাজটি আছে যাকে মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগে আক্রান্ত কোন ব্যক্তি হঠাৎ ঘটে যাওয়া কাজ বলবে না?

৫. গোপন রহস্য বলতে এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির এমনসব কাজ বুঝানো হয়েছে যেগুলো রহস্যাবৃত্ত রয়ে গেছে আবার এমন সব কাজও বুঝানো হয়েছে, যেগুলো বাহ্যিক আকৃতিতে জন সমক্ষে এসে গেছে কিন্তু সেগুলোর পেছনে সক্রিয় নিয়ত, উদ্দেশ্য, স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্খা এবং সেগুলোর গোপন কার্যকারণ লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে। কিয়ামতের দিন এসব কিছু উন্মুক্ত হয়ে সামনে এসে যাবে। সেদিন কেবলমাত্র কে কি করেছে এর তদন্ত ও হিসেব-নিকেশ হবে না বরং কি কারণে, কি উদ্দেশ্যে, কি নিয়তে ও কোন্ মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ কাজ করেছিল তারও হিসেব হবে। অনুরূপভাবে এক

ব্যক্তি যে কাজটি করেছে দুনিয়ায় তার কি প্রভাব পড়েছে, কোথায় কোথায় তার প্রভাব পৌঁছেছে এবং কতদিন পর্যন্ত এ প্রভাব অব্যাহত থেকেছে—তাও সারা দুনিয়ার চোখ থেকে গোপন থেকেছে, এমনকি যে ব্যক্তি এ কাজটি করেছে তার চোখ থেকেও। আর একটি রহস্যও শুধুমাত্র কিয়ামতের দিনেই উন্মুক্ত হবে এবং সেদিন এর পুরোপুরি তদন্ত ও হিসেব–নিকেশ হবে। সেটি হচ্ছে, এক ব্যক্তি দুনিয়ায় যে বীজ বপন করে গিয়েছিল তার ফসল কতখানি পর্যন্ত কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে সে এবং তার সাথে আর কে কে কাটতে থেকেছে?

৬. আকাশের জন্য ذَاتِ الرَّجْعِ (বৃষ্টি বর্ষণকারী) বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'রজুআ' (رجع) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ফিরে আসা। তবে পরোক্ষভাবে আরবী ভাষায় এ শব্দটি বৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়। কারণ বৃষ্টি মাত্র একবার বর্ষিত হয়েই খতম হয়ে যায় না বরং একই মওসুমে বারবার এবং কখনো মওসুম ছাড়াই একাধিকবার ফিরে আসে এবং যখন তখন বর্ষিত হয়। বৃষ্টিকে প্রত্যাবর্তনকারী বলার আর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর সমুদ্রগুলো থেকে পানি বাষ্পের আকারে উঠে যায়। আবার এই বাষ্পই পানির আকারে পৃথিবীতে বর্ষিত হয়।

৭. অর্থাৎ যেমন আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং তার ফলে মাটি চিরে উদ্ভিদের অংকুর গজিয়ে ওঠা কোন হাসি–ঠাট্টার ব্যাপার নয় বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ ও নিরেট সত্য, ঠিক তেমনি কুরআন মানুষকে আবার তার আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে এই মর্মে যে বিষয়টির খবর দিচ্ছে, সেটিও কোন হাসি–ঠাট্টার ব্যাপার নয়। বরং সেটি একটি চূড়ান্ত ও মীমাংসাকারী কথা, একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় নিরেট সত্য। সেটি পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েই ক্ষান্ত হবে।

৮. অর্থাৎ কাফেররা কুরআনের দাওয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য নানা ধরনের অপকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। তারা ফুঁক দিয়ে এ প্রদীপটি নিভিয়ে দিতে চাচ্ছে। মানুষের মনে সব রকমের সন্দেহের জাল বুনে দিচ্ছে। একের পর এক মিথ্যা দোষারোপ করে যাচ্ছে কুরআনের দাওয়াত পেশকারী নবীর বিরুদ্ধে। এভাবে দুনিয়ায় যাতে তাঁর কথা বিস্তার লাভ করতে না পারে এবং তিনি যে কুফরী ও জাহেলিয়াতের আঁধার দূর করতে চান তা যাতে চারদিক আচ্ছন্ন করে রাখে সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৯. অর্থাৎ এদের কোন অপকৌশল লাভে কামিয়াব না হয় এবং অবশেষে এরা ব্যর্থ হয়ে যায় আর এই সংগে যে আলোর শিখাটিকে নিভিয়ে দেবার জন্য এরা সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেটি যাতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, সে জন্য আমি ব্যবস্থা অবলম্বন করছি।

১০. অর্থাৎ এদেরকে ছেড়ে দাও কিছুক্ষণের জন্য। এরা যাকিছু করতে চায় তা করে দেখুক। বেশী সময় যাবে না, এর ফলাফল এদের সামনে এসে যাবে। তখন আমি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলাম তার মোকাবিলায় এদের অপকৌশল কতটুকু সাফল্যের মুখ দেখেছে তা এরা বুঝতে পারবে।